অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলির সঙ্গে হারেমটাও উঠে এল কলকাতায়।
গানে, ভাষায়, শৌখিনতায়, শিল্পে কলকাতার জনজীবন মজে গেল।

কলকাতার মুসলমান

রেজাউল করিম

(চিকিৎসক, সমাজকর্মী)

পণ্ডিতরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে বাঙালি জাতির বয়স কমপক্ষে ৫০০০ বছর। আর্য্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বিস্তৃত বৃহৎ-বঙ্গ একটি উন্নত সভ্য-জাতির বাসভূমি। বছরে ৫০ সেমি বৃষ্টি-বিধৌত এই বাঙলা ধান চাষে বিশেষভাবে পটুত্ব অর্জন করেছিল। অজ্ঞাতনামা কবির একটি শ্লোকে ফসলতোলার দিনে পল্লীসমৃদ্ধির মনোহর বর্ণনা পাই। "চাষিদের ঘর কেটে আনা ধানের স্তূপে সমৃদ্ধ। সংলগ্ন (জলাশয়ে) নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমাকে যেন দীর্ঘ্যায়িত করেছে। গাই-ষাঁড়-ছাগল ঘরে ফিরে এসে নতুন গোয়াল পেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। গ্রামগুলি নিকটস্থ আখমাড়াই কলের শব্দে মুখর আর গুড়ের গন্ধে আমোদিত। "বঙ্গ-ভূমিকা : সুকুমার সেন। সুজলা সুফলা শান্ত জনপদ ও তার অলস জীবনযাত্রা সত্ত্বেও বাঙালির লাবণ্যপূর্ণ সুগঠিত মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব এই জনগোষ্ঠীকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছে। তার সযত্ন-লালিত সংস্কৃতির

খ্যাতি সারা দেশে। মাটির বাসনপত্র বানানো ও দুর্ধর্ষ নৌ সেনা হিসেবে ও তারা খ্যাতি লাভ করেছিল। এই জনপদ আর্যদের কাছে ব্রাত্য ছিলো। তারা এই জনপদকে এড়িয়ে চলতেন, এমনকি তা পূজার্চনার যোগ্য নয় বলে মনে করতেন। বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী তাদের দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছ। কেউ এই অঞ্চলে পা রাখলে তার অশেষ দুর্গতি হতো, এমনকি, প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত করতে হতো বলে উল্লিখিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে যে অগ্নি গন্ডক-নদী পার হয়ে বাঙলায় প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিলেন। কালের নিয়মেও প্রধানত সুলভ খাদ্যের সন্ধানে আর্য্যরা এই সংস্কার থেকে মুক্ত হন। তাদের আগমনে বাঙলার সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ঐতিহাসিক উপাদান থেকে আদিবাঙালির আর যে সব গুণাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল - চিত্রশিল্পে তাদের পারদর্শিতা, তাদের সহজ-সরল জীবনযাত্রা, তাদের ভাবালুতা ও অতিথিপরায়ণতা। বর্তমানের ভীরু বাঙালির ঐতিহাসিক কালের চমকপ্রদ বীরত্বের কাহিনী রূপকথার গল্প বলে মনে হতে পারে। "একদা এই প্রাচ্য ও গঙ্গা-রাঢ়দেশের বিক্রান্ত যোদ্ধাদের ভয়ে আলেকজান্ডারের সৈন্যরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছিল।" যিশুর জন্মের আগে লিখিত সাহিত্যে বাঙালির শৌর্য-বীর্য্যের চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। "On the doors of will I represent in gold and ivory the battle of the gangaridae and the arms of our victorious Quinirinius" Goergics (III 27)। রঘুবংশে বাঙালির শৌর্য্য, রণকৌশল ও রণতরী চালনায় দক্ষতার প্রশংসা করা হয়েছে। বাঙালি আবেগপ্রবণ ও তার ভাবালুতা অনেকসময়ই আত্মঘাতী। বাঙালির ভাবালুতা এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন 'চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে এক বাঙালি অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সত্যসত্যই পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।" বর্তমান যুগের মসীজীবি বাঙালির পূর্বপুরুষ ছিলেন জাত-ব্যবসায়ী। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল-এ চাঁদ সদাগর চলেছেন বাণিজ্যে, সপ্তডিঙা মধুকর চেপে। দূরদেশে যাওয়ার পথে চোখে পড়ল সপ্তগ্রাম। দেখলেন:

অভিনব সুপুরি দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা
নানা রত্ন ও বিশাল জ্যোতির্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রবালের ধারা।

বাঙালির চরিত্রের আরেকটি দিকের কথা উল্লেখ করতে চাই। তাহল, তার উদারতা আর দানশীলতা। "কি সাহিত্যে কি শিল্পে, কি ধর্মে বাঙ্গালি যে পথে চলিয়াছে সেই পথেই তার লক্ষ্য ভূমা। এই আদর্শের মধ্যে কোনো সীমারেখা, সঙ্কোচ বা দ্বিধারভাব দেখা যায় না; বাৎসল্য, দাম্পত্য, বা লৌকিক ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা এমনকি সুরুচির অনুরোধে ও এই আদর্শকে ক্ষুন্ন করা হয় নাই। দাতাকর্ণের (চম্পাকেশ কর্ণ আমাদের

প্রতিবেশী অঙ্গ - এর শাসক ছিলেন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ তাঁর সাম্রাজ্যের অংশ ছিলো। তাঁর বীরত্বের উপাখ্যানের চেয়ে তার দাতা রূপ ই বাঙালির প্রিয়)। গল্পটি খুব প্রাচীন - দাতাকর্ণের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় অর্ধশতাধিক পুঁথি রক্ষিত আছে। একসময়ে প্রত্যেক বাঙালি ছেলেকেই এই পুস্তক পড়িতে হইত। অতিথি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন এই সত্য রক্ষার উদ্দেশে কর্ণ ও তাহার সীমন্তীনি তাঁহাদের একমাত্র পুত্রকে "অতিথি সেবায় দান করেছেন। বঙ্গের এই আদর্শটি মাতৃকরুনার জন্য পর্যন্ত একটুমাত্র অবকাশ রাখে নাই"। বাঙালি তার প্রাকৃতিক ও মানসিক ঐশ্বর্যে বলীয়ান হয়ে যেভাবে প্রবল প্রভায় আকাশ-বাতাস আলোকিত করছিল তা ইতিহাস ও পুরাণে বহুকথিত। আমাদের অতীশ দীপঙ্কর একসময় জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় সারা বিশ্বের আলোক-দিশারী ছিলেন, আমাদের বিজয় সিংহল জয় করে অতুলনীয় শৌর্যের উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-উপকূল বরাবর বাঙালি রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তৃত করেছিল, এমন কি তা পাঞ্জাব ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হয়েছিল। ভাষাবিদরা মনে করেন সিংহলি ও কোঙ্কনী মূলতঃ বাঙলার অপভ্রংশ।

কিন্তু বাঙালির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা তার ছায়া সুনিবিড় শান্তির পরিবেশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। একদল ভাগ্যান্বেষী তাতার দস্যু ভারতীয় বিবাদমান রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার দখল নিয়েছিল, এখন তারা বন্যার জলের মতো বাঙলার দিকে ধেয়ে এল। ন্যায় যুদ্ধের নীতিতে অবিচল বাঙালি যোদ্ধারা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখল অপরিচিত শত্রুরা কোনো নিয়ম মানে না। মারি অরি পারি যে কৌশলে এই তাদের একমাত্র মন্ত্র। অবশেষে মাত্র সতের জন সৈনিক নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে তারা বাঙলার রাজসিংহাসন দখল করলো। এদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল অশ্ব-বিক্রেতা হিসেবে। পাল যুগে (৭৬০-১১৬১)র শুরু থেকেই তারা বাঙলার সমৃদ্ধির খোঁজ পেতে শুরু করেছিল। ৯৫৬ সনে মাসুদির লেখা থেকে জানা যায় আরবীয় বা পারসিক মুসলিমরা সমতটে স্বল্প-সংখ্যায় বসবাস করছেন মূলতঃ ব্যবসায়ের জন্য। এই সব আরবীয় মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাঙালি বৌদ্ধ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। তাঁদের কেন্দ্র করে দুটি প্রতিস্পর্দ্ধী স্রোত তৈরী হয় - চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে উঠে বৌদ্ধ-ব্যবসায়ীদের চারণক্ষেত্র আর মুসলিমরা মুলত আরব সাগরের মাধ্যমে বস্ত্র-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়।

মুসলিম আক্রমণের একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট অবশ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ-উদারবাদের সঙ্গে হিন্দু গোঁড়ামির সংঘাতে। বৌদ্ধ-ধর্ম কালক্রমে শুধুমাত্র আচার সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসে যে নিয়মে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘাতে নতুন সভ্যতারজন্ম হয় - রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "struggle between the constructive spirit of machine, which seeks the cadence of order and

comformity in social organization and the creative spirit of man, which seeks freedom and love for its self expression" জনগণ ক্রমে ক্রমে সংস্কার-সর্বস্ব গোঁড়া হিন্দু শাসনে ক্লান্ত হয়ে মুক্তির পথ খুঁজছিল। এই সময়ে বৌদ্ধদের সঙ্ঘ ও মঠগুলি নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। একসময়ে বাংলার গ্রাম প্রান্তর বৌদ্ধ-স্থাপত্যের লীলাভূমি ছিল। শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষে সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তার সৃষ্টিছাড়া ফরমান হল বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখামাত্র খতম করতে হবে। কেউ তার অন্যথা করলে তারও মৃত্যুদণ্ড হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি জনগণ বিরূপ হওয়ায় সেন রাজারা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য পশ্চিমগামীনি ভাগ্যদেবীর রূঢ় আঘাতের পূর্বানুমান করতে পারেন নি। সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এক অপরিচিত ধর্ম তার অদ্ভুত বিচিত্রতা নিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করলো। বখতিয়ারের বহু বিতর্কিত বঙ্গ-বিজয়ের অন্তত সমসাময়িক কালে আর একদল মানুষ নিঃশব্দে বাঙলাদেশে প্রবেশ করছিলো (আমরা বাংলাদেশ ই বলছি অনেকগুলো কারণে। প্রথমত যদি আদি বাঙলা অনেকগুলি বিভাগে বিভক্ত ছিল তবুও তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ অভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ বাংলা চিরদিন স্বাধীন ছিল। তা অখন্ড দেশ হিসেবে ৫০০০ বছর ধরে এরই রাজনৈতিক শক্তির অধীনে ছিল। নীহাররঞ্জন দ্রষ্টব্য)। বীরভূমে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় বখতিয়ারের ঘটনার মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এই নিঃশব্দচারীরা বীরভূমে একটি খানকাহ তৈরী করেছেন। এরা নিজেদের সুফি নাম চিহ্নিত করেন, রাজনৈতিকভাবে যারা ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তারা অবাধ লুণ্ঠন আর হত্যালীলা চালিয়েছিল। ইসলামি আদর্শ সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি যেসব বিশেষণ দিয়ে ধর্মান্তর ইত্যাদিকে গৌরবান্বিত করা হয় তার সম্পর্কে এদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে এই একচক্ষু লোকটি কি অবলীলায় বিক্রমশীলা মহাবিহারের নিরস্ত্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছিল ও তাদের সমস্ত পাঠাগার পৈশাচিক আনন্দে ধ্বংস করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজশক্তির উত্থানের সঙ্গে বাঙলায় ইসলামের উত্থানের কোনো সম্পর্ক ছিলো না - একমাত্র সম্পর্ক এই যে এই দুটি ঘটনা সমাপতিত। রাজশক্তির সমাবেশ ঘটেছিল যেসব জায়গায় তৎকালিন যুগে তো বটেই, এমনকি এখনো, মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যালঘুতর। শ্রীরাম শর্ম্মা দেখিয়েছেন "the wonder is not so many were converted but the vast majority of Hindus kept their faith amidst so many temptatoions and such persecutions" (history of Sufism in Indian pp 426). "temptation and persecution" ছিল কিনা বোঝার জন্য আমরা আরেকটু উদ্ধৃতি দিতে চাই : "None of these (eastern) districts contains any of the places famous as the head-quarters of Munammadan rulers. Dacca was the residence of the Nawab for about a hundred years, but it contains a smaller proportion of Muslims than any of the surrounding

districts, except Faridpur. Malda and Murshidabad contain the old capitals, which were the center of Musalman rule for nearly four and a half centuries, and yet the Muslims form a smaller proportion of the population then they do in the adjacent districts of Dinajpur, Rajshahi, and Nadia. (The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760 : Richard M. Eaton) এটন সাহেব আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মূলতঃ সুফি সন্তরা জঙ্গল পরিষ্কার করে বাঙালির চাষবাসের জমি বানিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তারা সচেতনভাবে ধর্মান্তরের চেষ্টা না করলে ও খুব সহজেই ইসলামের যুগপুরুষদের হিন্দু অবতারে পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা হয় নি। প্রথমদিকে এই নব-মুসলিমরা দুটি ধর্মের আচার-বিচার ই পালন করতেন। ওয়াহাবি আন্দোলনের স্রোত তখনও তার বিষবাষ্প দিয়ে বাংলাকে কলুষিত করে তুলতে পারেন নি। সুফি-প্রভাবে এক অদ্ভুত মিশ্র-সংস্কৃতি বাঙলার ঘরে ঘরে শশিকলার মতো বেড়ে উঠছিল। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে দুটিধর্মের উৎসবই পালন করতেন। ঈদ ও দুর্গাপূজার উৎবের মধ্যে তারাকোনো ফারাক দেখতেন না। ১৮৭২ সালের জনগণনায় দেখা গেলো পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কারা নবধর্মে দিক্ষিত হল তার একটি তালিকা সংযোজন করেই আমরা এ প্রসঙ্গের আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই "Mukundaram mentions fifteen Muslim *jitis* in a list of comunities inhabiting an idealized Bengali city of his day weavers (*joli*), livestock herders (*mukeri*), cake sellers (*pithri*), fishmongers (*kibiri*), converts from thelocal population (*garasil*), loom makers (*sinikir*), circumcisers (*hijim*), bow makers (*tirakar*), papermakers (*Kigaj* +), wandering holy men (*kalandar*), tailors (*darji*), weavers of thick cord (*benati*), dyers (*rangrej*), users of hoes (*hilim*) and beef seller (*kasii*) (The rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204_1760 : Richard M. Eation)। যে সমস্ত সুফি-সাধুরা বাঙলায় ইসলাম ধর্ম বিস্তারে ও দুটি বৃহৎ ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাইখ (শিক্ষক) জালালুদ্দিন তিবরিজি। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেখশুভোদয়া পুস্তকখানিতে তার বিচিত্র জীবনকথা বর্ণনা করা হয়েছে। Shorn of the fabulous qualities characteristic of all man gala-kivya literature, the Seka (ubhodayi) suggests something of how the Islamic frontier and the agrarian frontier converged in the premodern period. Instead of presenting the shaikh as a holy warrior at no point in the narrative does he engage the Hindus of Pandua in armed combat the text seeks to connect the diffusion of Islam with the diffusion of agrarian society In this respect, several elements in the story are crucial : (1) the shaikhs charismatic authority and organizational ability, (2) the construction ofthe mosque, (3) state support of the institution, (4) the shaikhs initiative

in settling forested lands transferred to the institution, and (5) the transformation of formerly forested lands into wealth-producing agrarian communities that would continue to support the mosque. In thisway, the poem sketches a model of partronage a mosque linked economically with the hinterland and politically with the state that was fundemental to the expansion of Muslim agrarian civilization throughout the delta. যেসব সুফী ধর্মগুরুরা ইসলামের আদর্শ দিয়ে বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁরা হলেন - শাহ জালাল, সাইখ আলা-উল-হক, নুর কুতুব ই আলস (চৈতন্য দেবের সমসাময়িক), ইব্রাহিম শিকরী, ইসমাইল গাজী (লক্ষনাবতী), উমর সাহ (নোয়াখালি), অবদুল্লাহ কিরমানী, মকদুম শাহ গজনভী, শাহ সফিউদ্দিন, সৈয়দ অব্বাস আলি মক্কী, বদরুদ্দীন, মখদুম শাহ দৌলা, সৈয়দ আলি তবারকী, শাহ আলি বাগদাদী, ফরিদ্দুদিন, আহমদ নুরী, বদর শাহ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ দাবী রাখে। শায়খ আলা-অল-হক (পান্ডুয়া) ছিলেন বিখ্যাত খালিদ-বিন-ওয়ালিদের উত্তরপুরুষ।

পুরানো কলকাতার মুসলিম :

"thus from the midday halt of charnock
grew a city
as the fungus sprouts chaotic from its bed
so it spreads..." পুরনো কলকাতার কথাচিত্র।

কলকাতা তখনও কলকাতা হয়নি। কেউ বলতেন কলকাতা গ্রাম। আবার আইন ই আকবরীতে উল্লেখ করা হয়েছে মহল-সারা বাঙলা মুলুকে ৬৭৪টি মহলের একটি। তা এই ডিহি কলকাতা ৪৬৮ টাকা ৯ আনা ৯ পয়সা খাজনার বিনিময়ে ইংরাজরা প্রজাসত্ত্ব পেয়েছিলেন ১৫৯৮ সালের ১০ নভেম্বর। ১৬৯০ সালে জোব চার্নক তার বাঙালি বউ নিয়ে এখানে এসে বসবাস করতে লাগলেন। কলকাতায় তখন বনের গায়ে বন। জঙ্গলের গায়ে জঙ্গল। আস্তে আস্তে কলকাতা গড়ে উঠতে লাগলো। ইংরেজের সমৃদ্ধির সাথে সাথে কলকাতার গুরত্বও বাড়তে লাগলো। কাজের সন্ধানে হাজার জাতের মানুষের আনাগোনা চলতে লাগলো। বেজাত-কুজাত-সুজাত সব পাশাপাশি বসবাস শুরু করলে। সেকালের ছড়ায় তার সমর্থনও পাওয়া যায় ঃ

জাতির কর্ত্তা রাজীব রায়, মুকুলের শোবা।
তার হুকুম তুচ্ছ করে, দত্ত হলেন ধোবা।
দুলাল হল সরকার, ওক্কুর হল দত্ত
আমি কিনা থাকবো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত।

তা এই নতুন কায়েত পুরোনো কায়েতের সাড়ে বত্তিশ ভাজার মধ্যে মুসলমান কোথায়? তাদের কিন্তু তেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দলিল থেকে দেখা যায় সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণ করেন তখন কম-বেশী ৫০ হাজার

(?) মানুষ কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কলকাতায় ফেরানোর জন্য কোম্পানী যে ক্ষতিপূরণের তালিকা দেন তাতে তিনজন মুসলমানের নাম পাওয়া যায় - ৩নং আলিজার ভাই পেয়েছিলেন ১৭৪৫৭ টাকা, ১২ নং মহম্মদ সাদেক পেয়েছিলেন ১ টাকা মাত্র ও ১৩ নং আইনুদ্দিন কোনো টাকা চান নি, পান ও নি। অর্থাৎ, মুসলমান জনসংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। বাঙালি মুসলিম ছাড়া অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে দলে দলে লোক কলকাতায় ভীড় করতে থাকে। তারা মূলতঃ পেশাজীবি যারা কাজের সন্ধানে বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, কাবুল, রাজস্থান ও গুজরাট থেকে তল্পিতল্পা নিয়ে কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করে। তারা মুখ্যতঃ উর্দু ভাষায় কথা বলত। যদিও ১৮৭২ সালের জনগণনায় দেখা যায় কলকাতার শতকরা ৮০জন মুসলিম প্রজাই তাদের পারিবারিক উপাধি সেখ বলে জানিয়েছেন, কলকাতা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বহুমাত্রিক, সেখ, সৈয়দ, খান, আনসারি, কুরেশী, খুঁজরা, কসাই, মোমিন, শামসীতে কলকাতা ভরে উঠল।

অবশ্য বাঙলার অন্য জায়গার মতো কলকাতাতেও অনেক পিরের আবির্ভাব হয়েছিল। জুলিয়ান কটন মোট ১৩টি পুরানো মসজিদ ও দরগার বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পিরের নাম নথিভুক্ত করা যেতে পারে ঃ

১) মানিক পির - আপার সারকুলার রোড

২) জুমা পির ক্লাইভ স্ট্রীট, বড় বাজার - বর্তমান পিরের দরগার জায়গায় কাশীনাথ নামে একব্যক্তির মুদির দোকান ছিলো। আনুমানিক সময়কাল- ১৮০৮। কথিত আছে অশিক্ষিত মুদি কাশীনাথ পিরের দোয়ায় দেওয়ানি কাশীনাথে পরিণত হন।

৩) রজব আলির দরগা - হেস্টিংসে অবস্থিত - আনুমানিক সাল ১৭৯০।

৪) কাশিয়াবাগানে আছে লক্ষ্ণৌ এর নবাবের পোষ্যপুত্র ওয়াজিব আলির কবর - সাল ১৭৯৯।

৫) কুতুবুদ্দিন মসজিদ শেয়ালদা আনুমানিক ১৮২৫ সালে নির্মিত।

ভেলোরে বিদ্রোহ করতে গিয়ে টিপুর বড় ছেলে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লেন। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে গিয়ে কয়েকজনকে মেরে ফেলা হল আর তাঁর ছোটছেলে ও ভাই আব্দুল করিমকে কলকাতায় নির্বাসিত করা হল। তারা এলেন ১৮০৬ সালের ১০ই জুলাই থেকে ২০শে আগষ্টের মধ্যে এবং বর্তমান দক্ষিণ কলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন। তাদের পারিবারিক কবরখানা কালিঘাট পার্ক এলাকায়। ১৮৩২ সালে কলকাতার ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদ নির্মাণ করে প্রিন্স গুলাম মহম্মদ টিপু সুলতানের ছোট ছেলে। খাঁটি গ্রানাইট পাথরের তৈরী মসজিদটিতে একসঙ্গে ১০০০ লোক একসঙ্গে নামাজ পাঠ করতে পারেন। মসজিদের তিনটি গম্বুজ ও দুটি মিনার আছে। মূল মিনারটি ১৫১ ফুট উঁচু। এছাড়া, আরো দুটি মিনার আছে যার উচ্চতা

১০০-১১৭ ফুট। সামনের প্রধান দরজাটি বুলন্দ দরওয়াজার অনুকরণে তৈরী। মসজিদটির প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ হয় গোলাম মহম্মদ ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে। বর্তমান পার্ক-স্ট্রিট এলাকায় মীর জাফর আলি খান সাহেবের একটি পারিবারিক সম্পত্তি ছিলো। চারিদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা দ্বিতল বাড়িটির চারপাশে বড় বড় গাছ। বাড়ির মূল প্রবেশ পথে সুদৃশ্য গেট। এই বাড়িটিতে তারা পুরুষানুক্রমে বাস করতেন সেই কলকাতার শৈশব থেকে। বর্তমানে বাড়িটির করুন দশা - চারিদিকে ভগ্নস্তূপের মাঝে হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির দীর্ঘশ্বাস নিয়ে এখন ও টিকে আছে। বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে আসে নবাব আসিফ আলি মির্জার হাতে। তারপর তা যায় নবাব সাজিদ আলি মির্জার হাতে।

ওয়াজেদ আলী শাহ কলকাতায় এলেন ১৮৫৬ সালে। তার সাথে এল নবাবের হারেম, হাজার লস্কর, সিপাই শাস্ত্রী, আমির ওমরাহ। আর এল শাহী দরবারের বাবুর্চি, খানসামা আর মশলাচির দল। চারিদিকে বড়বড় বাড়ী তুলতে লাগলেন। ইমামবাড়া তৈয়ার হলো। সকাল-বিকাল হরেক খাবার আর শায়েরীতে ডুবে নবাব দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগলেন। খাবার-দাবার, দাবা আর সুরা নারী নিয়ে অযোধ্যার শেষ নবাব তার শেষ কটা দিন কাটালেন কলকাতায়। তার যাওয়ার সাক্ষী হিসেবে কলকাতায় থেকে গেলো তাঁর খানসামা-বাবুর্চির দল। তারা কলকাতায় বিভিন্ন হোটেল খুলে বসল। কলকাতার মোগলাই খানার সঙ্গে যুক্ত হল বিখ্যাত লখনৌ রেসিপি। বাঙালির পাতের অনেক প্রিয় খাবার-ই এসেছে এদের হাত ধরে। বাঙালির পাতে প্রতিদিনকার হাজারো খাবারের মধ্যে নিহিত আছে আমাদের দেশের ইতিহাসের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। তারকারী শব্দটি পারসী থেকে বাঙলায় এসেছে। তাছাড়া বিরিয়ানি, ভুনা, কোরমা, কষা, দম, রেজালা, কাঠি রোল, কোফতা, দোলমা প্রভৃতি তাহাদের মুঘল-তুর্কি-আফগান শাসনের সাক্ষ্য বহন করছে। ওয়াজিদ আলী শাহ কলকাতায় আসার পর বাঙালি মুসলমানের শুধু খাবার আর বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন হল তাই নয়, তার মুখের ভাষাও গেলো পাল্টিয়ে। বাঙলা ছেড়ে সে উর্দু ধরলো। এক অদ্ভুত জগা-খিঁচুড়ি ও গুলাবি উর্দুতে সে কথা বলতে লাগলো। হুতোমের নকশায় ওয়াজেদ শাহের কলকাতা আগমন অমর হয়ে আছে। "দরিয়ার ঘোড়া কিছুদিন শহরে থেকে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। লক্ষ্ণৌ এর বাদশা দরিয়াই ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, শহরে হুজুক উঠলো, লক্ষ্ণৌ এর বাদশা মুচিখোলায় এসে বাস করতেন, বিলেত যাবেন, বাদশার বাইয়ানা পোষাক, পায়ে আলতা, ঠিক যেন অ্যাকটা অপসরা। কেই বল্লে, আরে না, বাদশাটা একটা কুঁপোর মতো ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে। কেউ বল্লে ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদশা পার হন, সেদিন সেই ইস্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম : বাদশা শ্যামবর্ণ, একহারা, নাকে চশমা, ঠিক আমাদের

সৈয়দ আমীর আলি আইন ও বিচার ব্যবস্থায় কলকাতায় প্রথম সফল মুসলিম

মৌলভী সাহেবের মতো, লক্ষ্ণৌ এর বাদশা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিনকতক শহর বড় গুলজার হয়ে উঠলো। চোর বদমাইসও বিলক্ষণ দশটাকা উপায় করে নিলে, দোকানদারদের ও অনেক ভাঙা পুরানো জিনিস বেধড়ক দামে বিক্রি হয়ে গ্যালো, দু-একটা খ্যামটাওয়ালি বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদশা মুচিখোলার আদ্দেকটা জুড়ে বসলেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ শেষ হয়ে গ্যালে খেলতে বার করে গভর্মেন্ট ও সেরকম প্রথমে কিছুদিন বাদশাকে কেল্লায় পুরে রাখলেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙে

তেজের হ্রাস করে খেলতে ছেড়ে দিলেন। বাদশা ডমরুর তালে খেলতে লাগলেন, শহরের রূদ্দর, ভদ্দর, শেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেররা মাল সেজে কাঁদুনি গাইতে লাগলেন-বানর ও ছাগল জুটে গ্যালো। লক্ষ্ণৌ এর বাদশা জমি নিলেন, দুই-এক বড়মানুষ খ্যাপলা জাল ফেললেন অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্যন্ত উঠলো না - কেউ বল্লে কেঁদো মাছ! কেউ বল্লে রাণা, নয়, খোঁটা।

ভারতে রানীর শাসন শক্তিশালী কিভাবে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সিভিলিয়নরা কি ভাবতেন ন্যাথানিয়েল স্মিথকে ওয়াআরেন হেস্টিংস লিখিত একটি পত্র থেকে তার খানিকটা আঁচ করা যায়, যা পরবর্তীকালে দুটি সম্প্রদায়ের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। "*Every accumulation of knowledge and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise dominion founded on the right of conquest, is useful to the state [...] it attracts and conciliated distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in sybhjection; and it imprints on the hearts of our countrymen the senseof obligation nd benevolence [...] Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : and these will survive when the British domination in India shall have long ceased to exist*". ইংরেজ সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীর জাত। তারা তখন সইয়ে সইয়ে ভারতবাসীর গলায় শেকল পরাতে চায়। চালাক ইংরেজরা বাইরে দেখাতে চায় তারা কত উদার, কত বড় ধার্মিক। তাই উইলিয়াম জোন্স যখন কলকাতায় জজ হয়ে এলেন তিনি ঠিক করলেন যে দেশের ভাষা ও আইন না-জানা সঠিক বিচারের পরিপন্থী। তাই রীতিমত আরবি, ফার্সী ও সংস্কৃত শিখতে শুরু করলেন। এই সময়ে তিনি বহু চেষ্টায় কয়েকজন মুসলিম শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে আসেন ও তাদের মৌলভী ও মুনসী পদে নিযুক্ত করেন (১৭৮৯) "*...as the Maulavi for the doctrines of the Sunni's Muhammed Kasim who has applied himself from his earliest youth to the study of jurisprudence, and has acquired very just fame for his proficieny in it; for the doctrines of the Shiahs, where the two sects differ, (and, where they agree, both Maulavi's will unite in compiling approved texts) Siraju'lhakk, who is an excellent scholar well versed in law and in many branches of philosophy. As writers of Sanscrit and Arabick. I cannot recommened, (because I do not believe that all Asia could produce) two men better qualified, than Mahtab Rai and Haji Abdullah; the first a native of Decan, and the second, born at Medina, but educated at Mecca; both*

write beautifully and distinctly, and both are completely skilled in the several languages, which they undertake to copy."

তিনি চার্লস উইলকিনসনকে লেখা চিঠিতে মহম্মদ ঘাউস নামে আর একজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, একথা ভুললে চলবে না এসব পন্ডিত ব্যক্তিরা কেউ বাঙালি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান সংখ্যাই অত্যন্ত কম ছিল, তার কারণ মুলত কৃষিজীবি বাঙালিরাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ১৭৮০ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন থেকে মনে হয় এ সময় কলকাতায় মুসলিম জনসংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হলো প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ শাসকদের পক্ষে মুসলিমদের শিক্ষাবিস্তারের সর্বপ্রথম সচেতন উদ্যোগ। অবশ্য পুরুষদের মধ্যে না হলেও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল মূলতঃ Miss Cook Anne র উদ্যোগে। তিনি মোট ১৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৮/৫/১৯২৭ এ লেডিস এ্যাসোসিয়েশান নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। সর্বমোট ৩২০টি মুসলিম বালিকার শিক্ষার বিবরণ সেখানে পাওয়া যায়। সংবাদ প্রভাকর এক ভাষ্য অনুযায়ী ২৭/১২/১৮২০ সালে সকাল ১০টায় গৌরীবাড়ীতে ১৬০ জন বালিকা একটি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম বালিকাও ছিলো। মুসলিম নারী শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী হিসেবে ফরজুন্নেসার (১৮৩৪-১৯০৩) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,যদিও তার কর্মক্ষেত্র কলকাতার বাইরে। লতিফুন্নেসা (১৮৯৬) সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলা যিনি LMF পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ৮৯৭ সালে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৯১১ সালে বেগম রোকেয়ার উদ্যোগে একটি মহিলা বালিকা বিদ্যালয় তৈরী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হল যেখানে ধর্ম ও আইনের বাইরে আধুনিক শিক্ষায় মুসলিমদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল।

রাজানুগ্রহ ও রাজনৈতিক কারণ ছাড়া উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষের ইসলাম গ্রহণ প্রায় হয়নি বললেই চলে। এইসময় বরং ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করার হিড়িক উঠেছিল। একটি সংবাদে (মুনসী মেহের উললাহ : সুধাকর : ১৮৮৯) দেখা যায় কৃষ্ণনগরে ৫০০০ মুসলিম ধর্ম ত্যগ করে খৃষ্টের আশ্রয় নিয়েছে। চারিদিকে গেলো গেলো রব পড়ে গেলো এবং এই সব পাপী-তাপীদের আরো গোমরাহীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নানারকম কায়দা কানুন শুরু হল। মূলত এজন্যে ১৮৯০ সালে Islamic mission society তৈরী হয়। ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনায় দেখা যায় কলকাতায় জনসংখ্যা ১২৪২৮৩ জন। তার মধ্যে ১১২২৪ জন মুসলমান।

১৮৫৬ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট হোসেন দেলোয়ার (১৮৪০-১৯৬১) খাঁটি

বাঙালি। এই সময়ের আর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলিমের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন সেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহম্মদ রিয়াজুদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), পন্ডিত আর এ মাসুদি (১৮৫৯-১৯১৯)। কলকাতার প্রথম মুসলিম বার-এট-ল (১৮৭৩) সৈয়দ আমির আলি ৬/৪/১৮৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আশারফ শ্রেণীর মুসলিম ছিলেন। অনেক ব্যাপারে তিনি প্রথম হওয়ার দাবীদার। তিনি কলকাতা বেঞ্চের প্রথম মুসলিম জজ (১৮৯০-১৯০৪), লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির প্রথম মুসলিম সদস্য (১৮৭৮-৭৯)। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ স্পিরিট অফ ইসলাম গুণীজনের কাছে বহুল প্রশংসিত। কলকাতার প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসক ডাঃ রহিম খান ১৮৫৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেন। তিনি ১৮৭২ সালে খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তিনি এশিয়ার প্রথম চিকিৎসক যিনি কিং এডোয়ার্ড মেডিকেল স্কুলের সার্জেনসুপারিনটেন্ড হয়েছিলেন। ইংরেজীতে লিখিত তার কিছু রচনা পাওয়া গেলেও বাংলায় লেখা কোনো ভাষ্য পাওয়া যায় না। এইসময়ে কলকাতায় অনেক বিদ্বজ্জন সমাবেশ হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা হলেন—মৌলানা কারামত আলী (১৮০০-১৮৭৩), আবদুল লতিফ, নবাব আমির আলী, দেলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জা, সেখ আব্দুর রহিম। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এসময়ে গড়ে ওঠে মূলতঃ ইসলাম ধর্মের গুনগান ও তার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। পাশাপাশি অবশ্য ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ও তারা সচেষ্ট ছিলেন। তারা ইংরেজ রাজশক্তির তীব্র বিরোধী ছিলেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল- national mahmedan association (1856), mahmedan literary society (1863), national mahmedan association of calcutta (1877) সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী বাংলার জেলায় জেলায় গিয়ে প্যান-ইসলামিজমের কথা বলে বাংলার শতশত যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তারা মূলতঃ ওয়াহাবি সংস্কৃতিতে মুসলিম যুবকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেও তারা যথেষ্ট সোচ্চার ছিলেন। পণ্ডিত রিয়াজুদ্দিন এ সময়ে (১৮৮৯) সমাজ ও সংস্কারক নামক পুস্তকে আল-আফগানীর ভূয়সী প্রশংসা করেন ও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত বইটিকে বেআইন বলে ঘোষণা করা হয়। সেখ আব্দুর রহিমের (১৮৮৭) হজরৎ মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি নামে পুস্তকটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

কলকাতার আদি মুসলিম বাসিন্দারা যখন নিজেরে পুরনো দিনের স্বচ্ছলতার কাহিনী ও রাজা হিসেবে কত উন্নত ছিল একদিকে তার সুখস্বপ্নে বিভোর, অপরদিকে পারলৌকিক উন্নতিবিধানের জন্য নিজের আত্মার শুদ্ধতা ও পয়গম্বর ও মহাপুরুষদের জীবনাদর্শের বাণী প্রচার করতে ব্যস্ত তখন হিন্দু সমাজ জাগরিত হচ্ছে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে। বাঙলার নব-জাগরণের সে ফসল থেকে সম্মোহিত মুসলমান সমাজ

মানিক পীরের মতো বেশ কয়েকজন পীর, সুফি সাধক কলকাতা
ও বাংলা জীবনে অলংকার

নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখল। শিক্ষিত মুসলমানদের একটা অংশ ভারতবর্ষ যে দার-উল-হরবে পরিণত হয়েছে তার প্রচার করতে থাকল। তাই এদের মধ্যে অনেকে যদিও আধুনিক, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, বৃহত্তর ধর্মভীরু মুসলিম জনসাধারণ তাদের অশিক্ষা ও দারিদ্রের চেয়ে ইংরেজ শাসনকে বেশী বড় শত্রু বলে ভাবতে শুরু করেছিল। কাজি আব্দুল ওদুদ এই সময় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- 'অষ্টাদশ শতাব্দিতে মুসলমানরা আশ্চর্য্য চেতনাহীনতার শিকার। তাদের সে চেতনাহীনতার সঙ্গে এদেশে ইংরেজের রাজ্য বিস্তার এমন সন্তর্পনে নিষ্পন্ন হয়ে চলল যে, এত বড় একটা পরিবর্তনের কথা দু-পক্ষেরই অজানা রইল দীর্ঘকাল।' চিরস্থায়ী বন্দবস্ত মুসলমানদের চিরস্থায়ী দুঃখের কারণ হয়ে উঠল। এ সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য (হান্টার) : ১৮২৮ সালে ব্যবস্থাপক শক্তি ও শাসন শক্তি একযোগে এক বড় চেষ্টা করলেন। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের সৃষ্টি হল, আর তার পরে ১৮ বছর ধরে সমস্ত বঙ্গপ্রদেশে চলল সন্ধানী, মিথ্যা সাক্ষী, আর অটল ও মমতাহীন রাজপুরুষদের রাজত্ব। এই নিষ্কর বাজেয়াপ্ত আট লক্ষ পাউন্ড খরচ করে তিন লক্ষ পাউন্ডের স্থায়ী আয় সরকারের লাভ হলো, অর্থাৎ ৬০ লক্ষ পাউন্ড শতকরা ৫ পাউন্ড সুদে খাটলে

যা লাভ হতো তত আয়। এই অর্থের মোটা অংশ পাওয়া গিয়েছিল মুসলমান পরিবারের, অথবা মুসলমান প্রতিষ্ঠানের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর থেকে। এর ফলে যে ভীতির সঞ্চার হলো পল্লীর উপর তার চিরস্থায়ী ছাপ রয়ে গেলো। শত শত প্রাচীন পরিবার এর ফলে পথের ভিখারি হয়ে গেলো, আর, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যা এতকাল নিষ্কর আয়ে চলত সেগুলির মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠল।" আর একটি সমসাময়িক ঘটনা মুসলিমদের ভবিষ্যতের পক্ষে অতীব ক্ষতির কারণ হয়ে উঠল। তা হল রাষ্ট্র ভাষাও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফার্সির বদলে ইংরেজির প্রচলন। এর ফলে চাকুরির বাজারে মুসলমানের কানাকড়ি দাম রইল না, যদিও, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এর সুফল ভোগ করতে লাগলো। ঈশ্বর ভবিষ্যতে জাতিতত্ত্বের বীজ এই সময়ই বপন করেছিলেন। তখনকার মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতেই পারেন নি। তারা তখন, ইসলামের মহত্ত্ব আর নবি ও তার সাহাবিদের জীবনাদর্শ প্রচার করতেই ব্যস্ত ছিলেন। আইন সভার প্রতিনিধিরাও সাধারণ মুসলিম জনগণের এই দুরবস্থা নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেননি।

কলকাতার বাবু মুসলিমরা তখন নিজেদের মধ্যে গজ-কচ্ছপের লড়াই করছেন আর বাদবাকি দেশের মোটামুটি ১১০৪৬০১ (সেনসাস ১৮৭২) জন মুসলিম খাবার, শিক্ষা, বাসস্থানের অভাবে খাবি খাচ্ছেন। হুতুমের জবানিতে শুনুন তখনকার কথা 'ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী পুরোনো বছরের মতো বিদেয় হলেন কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন, বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা 'কুইনের খাস প্রজার আর দুঃখ রবে না' বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন, গর্ভবতীর যতদিন একটা না হয়ে যায়, ততদিন যেমন 'ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রক্লেমেসনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো। মিউটিনির হুজুক শেষ হলো বাঙালিরা ফাঁশী ছেড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরাপরাধে প্রাণদন্ড হল, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনের কপাল ফুলে উঠল, "যখন যার কপাল ধরে" ইত্যাদি কথা সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে গতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে, সেইরূপ ম্যুটিনি উপলক্ষে গভর্মেন্ট বাঙালি শব্দের কথঞ্চিত পদার্থ জানতে অবসর পেলেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" আশাও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষনে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালিদের দেখতে লাগলেন আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ। বাঁচলেম গায়ে বাতাস লাগলো।"

এদিকে তখন ওয়াহাবি ফারাজি আন্দোলন শুরু হয়েছে ইসলামী স্বর্ণ যুগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কোরান শরিফে আল্লাহ-তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন যে 'ইসলাম তোমাদের জন্য মনোনীত ধর্ম।" মুসলিমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন

যে আল্লাহ সারা পৃথিবীতে একমাত্র তাদেরই বৈধ উত্তরাধিকার দিয়েছেন। ততদিনে পাশার দান উল্টে গেছে। তারা তখন আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত—তারা যা করতে চেয়েছেন সবই তাদের বিরুদ্ধে গেছে— যেমনটি আকবরের প্রিয় কবিতায় পাওয়া যায়

"whoever puffs the god-lighted lamp
sets fire to his own beard"

বাস্তবেও দেখা গেল ইসলামী ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়েই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হচ্ছে। আব্দুল ওযাহাব বিশ্বাস করতেন যে এর মূল কারণ এই যে, মুসলিমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দুরে সরে গেছে। তিনি ইসলামকে তার হৃত মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হন। চতুর্দশ শতাব্দির ইবনে তায়মিয়া যেমনভাবে গুরুবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ওয়াহাব সেভাবেই গুরুপূজাকে যত নষ্টের গোড়া হিসেবে চিহ্নিত করেন। আব্দুল ওদুদ একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন— আরবে ওয়াহাবি আন্দোলনকে বলা যায় মুখ্যত ধর্মান্দোলন—তার রাজনৈতিক রূপ অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ অপ্রচ্ছন্ন।" ওয়াহাবিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। "পূর্ববঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকে ওয়াহাবি প্রচারকরা সাধারণতঃ বিশ বছরের কমবয়সী শতশত সরলমতি যুবককে অনেকসময় তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে নিশ্চিত প্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। যে ওয়াহাবি পিতার বিশেষ গুনবান অথবা বিশেষ ধর্মপ্রবন পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না কোন সময়ে তার পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে। যে সব যুবককে উধাও করা হয়েছে তাদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারীর আঘাতে বিনষ্ট করা হয়েছে। ওয়াহাবিদের এই বিরূপতা সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতি শাসকদের মনকে সহজেই বিরূপ করে তুলল আর তার অপরিহার্য ফল দাঁড়াল—দেশের শাসনকার্যের সঙ্গে মুসলমানদের অদ্ভুত বিচ্ছেদ।"

দেশ জুড়ে যখন এসব চলছে তখন সম্মোহিত মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় ইতিহাসের গতি বুঝতে অপারগ ছিলেন। তারা ধর্মের গোঁড়ামিকে আশ্রয় করে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছেন—তখন সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। তারা ভুলে গিয়েছিলেন কোরানের বাণী যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে—পথভ্রষ্ট হলে সৃষ্টিকর্ত্তা আরো উন্নত জাতি দ্বারা তাদের প্রতিস্থাপিত করবেন। আর খোদা তায়লা কে জানার জন্য বিস্তর জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন আছে। অবশ্য একেবারে বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর ছিলো না এমন নয়, তবে তা ছিলো খুবই দুর্বল।

এই সময়েই লতিফুর রহমান লিখেছেন—'আমি জানিনা মানুষকে কোনো বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করতে বলা যুক্তিযুক্ত কিনা। ধর্ম প্রচারকদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত

মানুষকে স্নেহপ্রবণ, সুন্দরও উদার হিসেবে গড়ে তোলা।" উন্নত জীবন ও তিনি লেখেন" "আত্মার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, অসত্য থেকে দূর থাকাই হল ধর্ম।" সেই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম কোরান শরিফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৮১-৮৬)। তাঁর অনুবাদটি সকলের কাছে ই খুব ই প্রশংসিত হল। এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের ইসলামি পুস্তক তিনি প্রকাশ করতে থাকেন। আর যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল তারা হলেন ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), সাইয়েদ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫০), মাওলাল আকরম খান (১৮৮৮-১৯৬৮), মাওলানা আবুল কালাম (১৮৮৯-১৯৫৮), লতিফুর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), কাজি এমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) পরবর্তীকালে এদের সাথে যুক্ত হন কাজী নজরুল ইসলাম, কাজি আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আব্দুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), এস ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১), রেজাউল করীম (১৯০-১৯৯৮) প্রভৃতি গুণীজন। মীর মোশারফ হোসেন (১৮৭৪-১৯১২) সম্ভবত প্রথম মনে রাখার মতো বাঙালি মুসলিম গল্পকার। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো বিষাদসিন্ধু।

এসব কতকাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা। এটা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে হিন্দু মুসলমানের পাস্পরিক সম্পর্কের ধীরে ধীরে অবনতি হচ্ছিল এবং দুই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ সে বিভেদ সৃষ্টির নয়া নয়া কৌশল রচনা করে চলেছিলেন তার বিরুদ্ধে মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের খুব বেশী সোচ্চার হতে দেখা যায় নি। এ সবই ছিল আত্মঘাতি হিমালয়-সদৃশ ভুল, যার বোঝা আজও দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই বহন করতে হচ্ছে।

মুসলিম আগমনে বাঙলায় যে মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হওয়ার আশা সৃষ্টি হয়েছিল নানাকারণে তা সাম্প্রদায়িকতার বিষে কলুষিত হয়েছে। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এখনও প্রান্তিক ও ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন। তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা নানা রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে রয়েছে। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বাঙালী জাতি। সুদীর্ঘ অতীত থেকে বাঙালী জাতি হিসেবে অখণ্ড ছিল। কিন্তু হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী আজ ত্রিখণ্ডিত। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাঙলার সংস্কৃতিক সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশাবাদী কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো জার্মানী বা ইয়েমনের মতো অখণ্ড বাঙলা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। যেখানে কবির কল্পনার বৃন্ত দুটি ফুলে সমন্বিত থাকবে- হিন্দু মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতি এক আরও উন্নত বাঙালীর জন্ম দেবে।